মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম লৌকিকতা ও আধুনিকতার মিশেল: একটি পর্যালোচনা

তপন কুমার সরকার*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার জগতে অন্যতম প্রবর্তক ও কিংবদন্তি শিল্পী কামরুল হাসান। শিল্পকলার জগতে তিনি পটুয়া কামরুল হাসান নামে খ্যাত। শুধু চারুশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়; বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পটুয়া কামরুল হাসান এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মে বাংলা ও বাঙালির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় বাঙালির স্বরূপ সত্ত্বাকে তিনি বার বার খুঁজে বেড়িয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। তাইতো তাঁর চিত্রকলার শেকড় বাংলার লোকঐতিহ্য তথা লোকশিল্পে গ্রথিত। এক্ষেত্রে তিনি গ্রাম বাংলার লোক কারুশিল্পীদের তৈরী শিল্পকর্ম বিশেষত মাটির পুতুলের গড়ন, বাংলার লোকচিত্রকলার অন্যতম ঐতিহ্য পটুয়াদের পটচিত্র প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি দেশের লোকশিল্প বিকাশে যেমন ভূমিকা রেখেছেন, পাশাপাশি নিজের শিল্পকর্মকে লোককলার বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন। ফলে তার চিত্রে লোকশিল্পের ভাষা ও মোটিফ গুরুত্বপর্ণ স্থান করে নেয়। অপরদিকে তার শিল্প লোকশিল্পের প্রভাবজাত হলেও তা আধুনিকতা বর্জিত নয়। শুধুমাত্র বাংলার ঐতিহ্য লোকশিল্পের উপরই নির্ভরশীল থাকেনি বরং বাংলার শিল্প ঐতিহ্যের প্রসার ঘটাতে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার কিছু কিছু শক্তিশালী চিত্র উপাদানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর নিজস্ব যে শিল্পধারা গড়ে উঠেছে সেখানে লৌকিকতা ও আধুনিকতার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। বলা যায় এদেশের লোকশিল্পের বিকাশ সাধনের পাশাপাশি লোককলার উপাদানকে নিজের আধুনিক চিত্রভাষায় রূপায়িত করে তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি তাঁর ঐতিহ্য-ভাবনা ও সমকাল চেতনায় আধুনিক চিত্রকলার জগতে যে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। বর্তমান প্রবন্ধে কামরুল হাসানের চিত্রকর্মে লৌকিকতা ও আধুনিকতার যে সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম শিল্প। আর শিল্প বিষয়টি স্বরূপ লাভ করেছে মানব সভ্যতার সমানুপাতে। মানব সভ্যতার যখন প্রকৃত বিকাশ ঘটেনি তখনও শিল্পের একটা রূপ ছিল। সেই রূপটির হয়তো আজকের মতো সঠিক গঠন ছিলো না। কিন্তু শিল্পের এই আদি রূপটিই মানবজাতিকে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়েছিল, শুধু তাই নয়, সভ্যতাকেও করেছে ত্বরান্বিত। মানব জাতির সভ্য হবার তাগিদ ক্রমাগত শিল্প নিজস্ব রুচি চর্চারই ফসল; যা মানব জাতির সুষ্ঠু বিকাশে ব্যাপক ভমিকা পালন করে। একটি জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি সাধিত হয় নিজস্ব ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে। আর গ্রামীণ ঐতিহ্যের শেকড়সমৃদ্ধ গ্রাম-প্রধান আমাদের এই বাংলাদেশ। আবহমান বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ ও লোকজীবনধারা এদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলার সংস্কৃতি তথা শিল্পকলার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে লোকশিল্প। ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প বাংলার লোকসমাজের সৃষ্টি এবং রুচির পরিচয় বহন করে। এর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলার জাতিতাত্ত্বিক আত্মপরিচয়। লোক জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় আমাদের লোকজ ধারা শিল্পের যতগুলো ধারা বিদ্যমান তার মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদাননির্ভর ধারাগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছে। কেননা শিল্পকলার মূল ভিত্তি লোকশিল্পে নিহিত। শিল্পকলার ইতিহাস এবং গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় বিশ্বের প্রথিতযশা অনেক শিল্পীই লোকশিল্প দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পকলার নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বাংলার ইতিহাসেও এমন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। বাংলার লোকজীবনধারা থেকে সামগ্রিক শিল্পের নির্যাস হতে বর্তমানে লোকশিল্পের যে ফর্মটি আমরা দেখছি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অন্যতম শিল্প উদ্যোক্তা ছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি প্রচলিত অর্থে পটুয়া অর্থাৎ জাতিতাত্ত্বিক বিচারে পটুয়া সম্প্রদায়ভূক্ত বা তাদের বংশধর না হয়েও নিজেদেরকে পটুয়া পরিচয়ে আখ্যায়িত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। শিল্প সাধনার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তিনি লৌকিকতা ও আধুনিকতার মিশেলে সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পের এক নিজস্ব ভুবন। সর্বোপরি ঐতিহ্য-ভাবনা ও সমকাল চেতনার সংমিশ্রণে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করে তিনি আধুনিক চিত্রকলার জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতীয়মান।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনা করতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কামরুল হাসানের অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রকলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে তার অঙ্কিত চিত্রকলার উপর আলোচিত বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে কামরুল হাসানের চিত্রকলা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জিত হবে এবং এই আলোচনাকে ঋদ্ধ করবে। এর ফলে পরবর্তী গবেষক, শিক্ষার্থী, সংস্কৃতিপ্রেমীদের কামরুল হাসানের চিত্রকলা সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।

১. কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার জগতে অন্যতম কিংবদন্তী চিত্রশিল্পী ও প্রবর্তক। এদেশের শিল্পকলার অঙ্গনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরেই তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। শুধু চারুশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়; বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কামরুল হাসান এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এই মহান শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায় এক ধর্মভীরু-রক্ষণশীল পারিবারিক পরিবেশে। বাবার নাম মোহাম্মদ হোসেন এবং মায়ের নাম আলিয়া খাতুন। কামরুল হাসান শিক্ষাগ্রহণ করেছেন প্রথমে কলকাতায় গভর্নমেন্ট মডেল এম. ই. স্কুলে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। পরে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট থেকে সুকুমার কলায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাথে মিলে ১৯৪৮ সালে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের মধ্য দিয়ে এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় তথা ঢাকায় চারুকলা চর্চার শুরু হয়েছিল। এই শিল্পচর্চার চারিত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি ও সমকালীন শিল্পচেতনার মাধ্যমে। এছাড়া কামরুল হাসান ঢাকায় চিত্রকলা চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আর্ট গ্রুপ। ১৯৬০ সালে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের নক্শা কেন্দ্রের প্রধান নক্শাবিদ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের শিল্প বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চিত্র-১ কলসি কাখে নারী-২, তেলরং
৯০ x ৬৫ সেমি, ১৯৭৯

চিত্র- ২ তিনকন্য-২, তেলরং
১০৫ x ৭৫সেমি, ১৯৮৩

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কামরুল হাসান গুরুসদয় দত্তের সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। গুরুসদয় দত্ত ছিলেন বাংলার লোকশিল্পের সংগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্রাবস্থায় কামরুল হাসান ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন। ঔপনিবেশবাদের বিপক্ষে বাঙালির গৌরবময় ঐতিহ্যকে নবরূপে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল গুরুসদয় দত্তের (১৮৮২-১৯৪১) ব্রতচারী আন্দোলন। কামরুল হাসান সেই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ব্রতচারী আন্দোলনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারী প্রসঙ্গ অবতারণার পশ্চাতে কারণ ব্রতচারী আন্দোলনের সদস্য থাকাকালে তিনি বাংলার লোকায়ত চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। অর্থাৎ এই ব্রতচারী শিবিরেই তাঁর সাথে পরিচয় ঘটেছিল পটচিত্র ও পটুয়াদের। এছাড়া গুরুসদয় দত্তের কাছ থেকে তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম এই শিল্পধারার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। পটুয়াদের মৌলিক রঙ ব্যবহারের রীতি, অবয়বের পার্শ্বদৃশ্য, দ্বিমাত্রিক চিত্রবৈশিষ্ট্য, রেখার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার এসবের বৈশিষ্ট্যকে তিনি তার চিত্রে প্রতিফলিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তার স্বীকারোক্তি, "১৯৪৬ সালে কলকাতা মসলিম আর্ট এক্সিবিশনে আমি প্রথম পট পদ্ধতির ছবি দিয়েছি।" বাঙালিত্বের প্রতি এবং বাংলার এই সপ্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি গভীরতর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থেকেই তিনি আজীবন নিজেকে 'পটুয়া কামরুল হাসান' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। (হক ২০০৩: ২৩)। এজন্য শিল্পকলার ইতিহাসে তিনি পটুয়া কামরুল হাসান নামে পরিচিত। যদিও পটুয়া তাঁর স্বঘোষিত উপাধি। এপ্রসঙ্গে কামরুল হাসানের নিজের বক্তব্যের আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি তাঁর খেরো খাতা ১ম খণ্ডে লিখেছেন—

> আমার *তিন কন্যা* (অয়েল পেইন্টিং) অপেক্ষা করছে। ওদের প্রসাধন বাকি। আজ চারদিন থেকে ওদের কাছে যাইনি, অথচ লোকজন এসে ওদের ঐ অবস্থায় দেখিয়াছে। তিনটি মেয়েই সন্দরী, নতুন ভাবে সাজাচ্ছি, ওরা নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছে আর আমার উপর অভিমান করছে। আমার তিন কন্যাকে আরও বেশি করে সাজাচ্ছি, কারণ ওরা এক সাথে কলসি কাখে নিয়ে যমুনায় যাবে (যমুনা ওয়েল ক্যালেন্ডারে ১৯৭৮)। তাই ওদের চোখে মুখে চঞ্চলতা দেখছি। ওরা আমার রাধিকা। রাধিকা কি তিনজন হয়? আমার কাছে হয়। আমি যদি কানাই হই তাহলে পটুয়া কানাই। তাহলে পটো কানাইয়ের কি একটি রাধিকায় চলে? এই যে ওদের জন্য এত কথা লিখলাম তা কি ঐ মেয়ে তিনটে বঝবে? ওরা আমার পিছনেই রয়েছে। আমাকে দেখছে আর খুনসুটি করছে। বলছে আমাদের গোপাল ঐ পোড়া লাল খাতায় কি পেল। (চিত্র-২)। (হাসান ২০১৭: ১৫১)

সুতরাং স্পষ্টতই বলা যায় কামরুল হাসানের সার্থকতা পটুয়া পরিচয়ের মধ্যেই। আর এই সার্থকতার পিছনে তাঁর নিজেকে পরিচিত বা জাহির করা উদ্দেশ্য ছিল না বরং এর পিছনে আমরা খুঁজে পাই পিছিয়ে পড়া পটুয়া ও তাদের শিল্পকর্মকে অগ্রগামী বা পরিচিতি এনে দেওয়া। বিশ্ব দরবারে এই শিল্পরীতিকে স্ব-মর্যাদায় আসীন করা। তথাকথিত সমাজব্যবস্থার জাতিতাত্ত্বিক বিচারে পশ্চাৎপদ পটুয়া সম্প্রদায় ও তাদের সৃষ্ট পটচিত্র সম্বন্ধে জানবার বা পরিচিত হওয়ার সুযোগ তিনি করিয়েছেন। শুধু তাই নয়

'পটুয়া' নাম গ্রহণের পিছনে লোকশিল্পী বিশেষত পটুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর একাত্মতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিকগুলি চিহ্নিত। শুধু নামে নয়; পটুয়াদের প্রভাব তাঁর কাজেও বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া পটুয়ার পাশাপাশি তাঁর শিল্পকর্মে দেখা যায় অন্যান্য বাংলার লোক কারুশিল্পীদের কাজের প্রভাব।

২. কামরুল হাসানের চিত্রকলা লোকশিল্পের প্রভাব জাত। এক্ষেত্রে তিনি গ্রাম বাংলার লোক কারুশিল্পীদের তৈরী শিল্পকর্ম বিশেষত মাটির পুতুলের গড়ন, বাংলার লোকচিত্রকলার অন্যতম ঐতিহ্য পটুয়াদের পটচিত্র প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি যামিনী রায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর চিত্র দর্শনও কামরুল হাসানকে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার লোককলার দিকে মনোযোগ দেন। গড়ে তোলেন লোকশিল্পীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেখতে থাকেন দেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প এবং অনুভব করেন এর শিল্প বৈশিষ্ট্য। যা তাঁর শিল্প রীতিকে করে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, চিত্র রীতিতে নিয়ে আসে পরিবর্তন। এক্ষেত্রে তিনি দেশের লোকশিল্প বিকাশে যেমন ভূমিকা রেখেছেন, পাশাপাশি তিনি নিজের শিল্পকর্মকে লোককলার বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন। ফলে তাঁর চিত্রে লোকশিল্পের ভাষা ও মোটিফ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ স্থান করে নেয়। একথা অনস্বীকার্য গ্রামীণ জীবণপ্রণালী থেকে শুরু করে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক রূপ লোকঐতিহ্যের মৌলসূত্র। আর লোকঐতিহ্যে প্রভাবিত হওয়ায় কামরুল হাসানের চিত্রকর্মের বিষয় শৈলীতে দেখা যায় বাংলার পুতুলের ফর্ম, রাজশাহীর শখের হাঁড়ির মাছ ও পাখি, প্যাঁচা, শেয়াল, সাপ, কুমির, ময়ূর, মোরগ, ঘোড়া, হাতি, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী তার চিত্রকর্মে স্থান করে নেয়। কামরুল হাসানের ছবির আর একটি গুরুত্বপর্ণ দিক নারী চরিত্র। শিল্পকর্মে প্রধান উপাদান হিসেবে নর-নারী; বিশেষত নারী চরিত্র স্থান পেয়েছে। যেখানে স্থান পেয়েছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য। সেখানেও রমণী বিশেষত বাঙালি নারীর বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গীকে তিনি নানা ভাবে, নানা আঙ্গিকে এঁকেছেন। যা বিষয় হিসেবে তাঁর ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে সারা জীবনব্যাপী। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর চিত্রকর্মে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা বাংলার সামগ্রীক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরদিকে শৈলীগত আলোচনায় বলা যায় বাংলার লোকচিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব দ্বিমাত্রিকতা। যা বাংলার ঐতিহ্য পটচিত্রে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কামরুল হাসান পটুয়াদের পটচিত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত যা তাঁর চিত্রকর্ম পর্যালোচনায় এবং গবেষকদের মন্তব্যে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে গবেষক সৈয়দ আজিজল হক তাঁর 'কামরুল হাসান' প্রবন্ধে বলেছেন—

> কামরুল হাসান পটুয়াদের সাথে পরিচিত হয়ে বাংলার প্রাচীনতম শিল্পধারা পটচিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। পটুয়াদের রঙ তৈরি, রঙের ব্যবহার রীতি, অবয়বের পার্শ্বদৃশ্য অঙ্কনের পদ্ধতি, দ্বিমাত্রিক চিত্র বৈশিষ্ট্য, রেখার স্বতঃস্ফর্ত ব্যবহার প্রভৃতি তাকে আকৃষ্ট করে। যার প্রতিফলন আমরা তাঁর চিত্রকর্মে লক্ষ করি। (হক ২০০৭: ২৮৯)

পটুয়া কামরুল হাসান লোকশিল্পের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর চিত্রকর্মে ত্রিমাত্রিক আবেদন সৃষ্টি করেছেন। সেখানেই কামরুল হাসানের বিশেষত্ব। তাঁর চিত্রকর্মে রঙের ব্যবহারও লোকশিল্পীদের প্রভাব জাত। লোকশিল্পীদের অনুকরণে তিনিও অধিকাংশ চিত্রে মিশ্ররঙের পরিবর্তে মৌলিক রঙ ব্যবহার করেছেন। পটুয়ারা রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে টোনাল ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি না করে সমতলীয় পদ্ধতিতে যেভাবে রঙ ব্যবহার করেন, কামরুল হাসানও অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই রঙের ব্যবহার করেছেন।

এছাড়া তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের মতো, বিশেষত হেনরি মাতিসের (১৮৬৯-১৯৫৪) মতো একই সমতলের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বর্ণ লেপনের মাধ্যমে রঙের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করেন যাতে ছবির বিভিন্ন অংশের মাঝে দূরত্ব গড়ে ওঠে, ফলে ছবিতে ত্রিমাত্রিক আবহ সৃষ্টি হয়।

চিত্র-৩ গোপন পত্র, কালি ও তুলি
৭৫ x ৫১ সেমি, ১৯৭৮

চত্র- ৪ ইমেজ-১, কালি ও তুলি
২২ x ১৬ সেমি, ১৯৮৩

কামরুল হাসানের ড্রইংয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানব অবয়ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে পটুয়া বা লোকশিল্পীরা মুখের প্রোফাইল বা পার্শ্বদৃশ্য অঙ্কন করতেন। কামরুল হাসান পটুয়াদের এই প্যাটার্ন গ্রহণ করে এর মধ্যেও এমনভাবে রেখার ব্যবহার করেছেন যাতে ছবির দ্বিমাত্রিকতা বজায় থাকে, আবার একই সাথে ছবির ত্রিমাত্রিক আভাস সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তিনি কিউবিস্ট রীতির দ্বারস্থ হয়েছেন। বিশেষ করে তার ছবিতে পাবলো পিকাসোর (১৮৮১-১৯৭৩) প্রভাব লক্ষ করা যায়। (হক ২০০৩: ২৪)। আমাদের দেশীয় রীতির সাথে একটি শক্তিশালী প্রাচ্যরীতির এ যেন এক

যুগান্তকারী মেলবন্ধন। যা তাঁর শিল্পকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন সুর। প্রায় পদদলিত লোকশিল্প বিশেষত পট শিল্পটিকে তুলে নিজের ব্যক্তিসত্তার সাথে যোগ করে আধুনিক শিল্প সংগ্রামে যেভাবে যুক্ত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। সেই বিচারে কামরুল হাসানে চিত্রকর্ম লৌকিকতা ও আধুনিকতার মিশেল বা সমন্বিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেক গবেষক। এদেশের লোকশিল্পের বিকাশ সাধনের পাশাপাশি লোককলার উপাদানকে নিজের আধুনিক চিত্রভাষায় রূপায়িত করে তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। সেই সাথে শিল্প সংগ্রামে ও উচ্চ মার্গীয় শিল্পের ভীরে অবহেলিত ও প্রান্তিক শিল্পধারাটিকে তুলে এনে দিয়েছেন সম্মান।

৩. কামরুল হাসান পরিপর্ণভাবে আধুনিক মানুষ ছিলেন। লোকশিল্পী বা পল্লী শিল্পী হিসেবে তিনি নিজেকে তৈরী করবেন এই ধারনা কখনই তাঁর ছিল না বলে গবেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে শিল্পের নির্যাস তিনি লোকশিল্প থেকে গ্রহণ করেছেন একথা স্পষ্ট। একাডেমিক কাঠামোতে আধুনিক শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করলেও শিল্পের শেকড়কে তিনি ভোলেননি। অর্থাৎ শিল্পকলার শেকড় যে লোকশিল্পে নিহিত তা তিনি অনধাবন করতে পেরেছিলেন। ফলে সেখান থেকে লোকজ উপকরণ, মোটিফ, শৈলী গ্রহণ করে নিজস্ব রীতিতে রূপদান করেছেন তার শিল্পকর্মে। অপরদিকে লোকশিল্পের পাশাপাশি শিল্পের রসদ সন্ধানে তিনি আধুনিকতাকেও গ্রহণ করেছিলেন একথাও গবেষকদের তথ্যে স্পষ্ট। ফলশ্রুতিতে লোকশিল্প ও আধুনিক শিল্পের সম্মিলনে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পের এক নিজস্ব ধারা। লোকশিল্প-উৎসারিত তাঁর আধুনিক শিল্পরূপ-আকার বিন্যস্ত চিত্রপট একদিকে বাংলার লোকসমাজ পরিবেশ কিংবা বাঙালির গ্রামীণ জীবনের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ ও সম্পৃক্ততার প্রতিফলন, অন্যদিকে বাংলার নিসর্গ প্রকতির আলো-হাওয়ায় গড়ে ওঠা তাঁর বাঙালির-মানস উদ্বুদ্ধ সচেতনতার প্রভাব। কামরুল হাসানের চিত্রপট সাক্ষ্য দেয় তাঁর আধুনিক শিল্প-চেতনা সমৃদ্ধ দষ্টিভঙ্গির ঘাটতি ছিল না, তিনি অনেকটা ঘোষণা দিয়েই যেন বিমূর্ত শিল্পের অন্যতম প্রবক্তা পাবলো পিকাসোর কিউবিস্ট-স্টাইল গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লোকশিল্পের প্রভাব ছিল সমধিক মাত্রায়, আর এক্ষেত্রে যামিনী রায়ের ছবির রঙ বৈশিষ্ট্য তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বোপরি বাংলার লোকচিত্রের সারল্য ও বর্ণিল উজ্জ্বলতা কামরুলের আপন শিল্পভবনকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। এই সমস্তকিছু মিলেই তাঁর কাজ বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গণে স্বকীয়তার গুণবৈচিত্র্যে স্বীকৃত। (আলী ২০০১: ২২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পটুয়া কামরুল হাসান যেমন লোকশিল্পীদের পাশাপাশি যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তেমনি যামিনী রায় আবার লোকশিল্পী, বিশেষ করে পটুয়াদের পটচিত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি ঠাকুর পরিবারে সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত চিত্রের দ্বারাও প্রভাবিত। চিত্ররীতি বা স্টাইলের দিক থেকে মৌলিকতার আলোচনায় সুনয়নী দেবীর নামই যামিনী রায়ের আগে আসে। আবার যামিনী রায়ের পথ ধরেই পরবর্তীতে আসে পটুয়া কামরুল হাসানের নাম। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সুনয়নী দেবীও পটুয়াদের পটচিত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। গবেষকদের

গবেষণা থেকে জানা যায়, যামিনী রায়ের পূর্বে বাংলায় আধুনিক যুগে সুনয়নী দেবীই সর্বপ্রথম বাংলার লোককলার গুণাবলীকে তার ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন। লোককলার অলঙ্করণ তিনি নেননি; নিয়েছিলেন রূপের সরলীকরণ, রেখার সাবলীলতা, রঙের সমতলীয়তা এবং বক্তব্যের ঋজুতা। এই অন্তঃরূপবাসিনী কোনরূপ প্রাক-শিক্ষা ছাড়াই নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিবোধ দ্বারা ছবি একেছিলেন। পট, কাঁথা, পুতুল, প্রতিমা ও আলপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহবাসের ফলে তাঁর মনে শিল্প চেতনা জেগেছিল। (সোম ২০১৭: ৯৯-১০০)। কলকাতাবাসিনী সুনয়নী দেবীর কাজের সাথে যামিনী রায়ের পরিচয় ছিল। বলা যায় পটুয়াদের বাইরে নতুন আঙ্গিকে তিনি পটচিত্র এঁকেছেন। সেখান থেকে হয়তো তিনি ধারণা বা অনুপ্রেরণা পেয়ে লোককলার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। আবার একই ধারাবাহিকতায় পটুয়া কামরুল হাসান আধুনিক শিল্প শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও লোককলার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ কারণেই আলোচ্য অংশে সুনয়নী দেবীর প্রসঙ্গের অবতরণা। কামরুল হাসানের সজন উত্তরণের পথে ধরে নেওয়া যায় লোককলার ভূমিকা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর চিত্রকর্ম লোকশিল্পের প্রভাবজাত যা তাঁর চিত্রকর্ম বিশ্লেষণ করলে সহজেই চোখে পড়ে। লোককলাই স্বভাবত তার চিত্রকর্মের মূল প্রণোদনা একথা বলাই যায়। গবেষকদের তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়; পটুয়া কামরুল হাসান পটচিত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বাংলার লোকঐতিহ্য পটচিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য লোকশিল্প যেমন লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি, মাটির মূর্তিকলা পুতুল, কাঠের খেলনা, শোলার পুতুল ও খেলনা, নকশিকাঁথা ইত্যাদির বর্ণাঢ্য শিল্পরূপ ও প্রভাব তাঁর শিল্পচর্চার ভিত্তিকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। কামরুল হাসান এসব দেখেছেন ঘুরে ফিরে এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন অতি মনোযোগ দিয়ে। এক্ষেত্রে তাঁর পর্যবেক্ষণ অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'লোকশিল্পের মর্মকথা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন— "লোকশিল্পকে জানতে হলে, জানতে হবে লোকজীবনের ইতিবৃত্ত। কারণ প্রত্যেকটি লোকশিল্পের মধ্যেই দেখা যায় লোকজীবন দর্শনের ছাপ, কিছু আচার-অনুষ্ঠান, কিছু সামাজিক, কিছ ধর্মীয় এবং সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশেরও কিছ কিছ ছাপ লোকশিল্পের সৃষ্টিমূলে রয়েছে।" (হাসান ২০০৮: ১৭৮)। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি লোকশিল্প তথা লোকচিত্রকলার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। যার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন তার চিত্রের আঙ্গিক ও শৈলীতে। শুধু তাই নয় ঐতিহ্য প্রিয়তার পাশাপাশি আধুনিকচেতা কামরুল হাসান ছিলেন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ষোলআনা বাঙালি। যার প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর চিত্রকর্মে। এ প্রসঙ্গে বিশেষত তাঁর চিত্রকর্ম মূল্যায়নে লোকশিল্প গবেষক মতলুব আলী তাঁর *রঙ-তলির মানষ কামরুল হাসান* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> কামরুল হাসানের সমগ্র কর্মকাণ্ডে তাঁর আবেগময় সংবেদনশীল ও সমাজ-সচেতন স্বদেশপ্রেমিক মন-মানসিকতার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তাঁর কাজের ভিত্তিতে রয়েছে বাস্তবতার অন্বেষা আর কামরুল হাসানের শিল্পকর্মের প্রকৃতিতে বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের প্রচণ্ড প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিল্প উৎকর্ষের মাপকাঠিতেও তাঁর কাজ বিন্দমাত্র খর্ব নয়। বরং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলনে কামরুল-চিত্র যথার্থ অর্থে বলিষ্ঠ ও বাঙময়। (আলী ১৯৯৪: ৫৬)।

আবার কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম মূল্যায়নে লোকশিল্প গবেষক আবুল মনসুর তার 'বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পে লোককলার প্রয়োগ: কামরুল হাসান' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "এদেশে কামরুল হাসানই লোকশিল্পের বিপুল প্রাচুর্যকে সমসাময়িক শিল্পের প্রয়োগে অমিত সম্ভাবনার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় উদাহরণ, এর শ্রেষ্টতম শিল্পীও আজ পর্যন্ত তিনি। পরবর্তী কালে লোককলাকে উপজীব্য করে যারা শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন তারা কেউই কামরুল হাসানের অর্জনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন এমন কথা বলা যাবে না।" (মনসর ২০১৬: ৪০৫)

আর সেখানেই কামরুল হাসানের বিশেষত্ব। চিত্রশিল্পের সৃজনশীল বিকাশের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সর্বদা তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে নতুন উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা। সময়ের প্রেক্ষিতে সেই প্রচেষ্টা এতটাই দুরদর্শী সম্পন্ন এবং শক্তিশালী ছিল যার কারণে তিনি অদ্যাবধি শিল্পকলার জগতে এক মহান আসনে অধিষ্ঠিত।

৪. কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি বাংলার ঐতিহ্য লোকশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন অনেকটা যামিনী রায় ও জয়নূল আবেদিনের হাত ধরে যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁর চিত্রকর্মের আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে তাদের প্রসঙ্গ। এদের চিত্রকর্মের সঙ্গে কামরুলের চিত্রকর্মের তুলনামূলক আলোচনায় চিত্রকর্মের বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়ে ওঠে। অনেক গবেষকই তাই করেছেন। চিত্রাঙ্কনে যামিনী রায় এবং কামরুল হাসানের যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা চিত্রকর্মের স্টাইলের দিক থেকে। কেননা উভয় শিল্পীই লোকশিল্পের দারস্থ হয়েছিলেন। সেখান থেকে শিল্পের মোটিফ তথা রেখা, নকশা, রঙ, ফিগারের বিন্যাস ও চিত্রতলের উপস্থাপনের ঐতিহ্যকে নিজের ভিতর আত্তর করে একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি সৃষ্টি করেছিলেন।

চিত্র-৫ রমণীর দৃষ্টি, তেলরং,
৯০ x ৬১ সেমি, ১৯৭২

চিত্র-৬ নিসর্গ ও পাখি, পোস্টার রং,
৭৬ x ৫১ সেমি, ১৯৭৩

অপরদিকে উভয় শিল্পী মনে প্রাণে আধুনিক ছিলেন। তাঁরা আধুনিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে আধুনিক চিত্রকর্ম মানেই যে পশ্চিমা বিমূর্ত প্রকাশবাদকে নির্ভর করে সৃষ্টি হবে তা নয়। এক্ষেত্রে যামিনী রায় যেমন তাঁর নিজের সময়কে যেভাবেই দেখেছেন, বুঝেছিলেন, সেভাবেই তাকে উপস্থাপন করেছিলেন তার ক্যানভাসে। অপরদিকে কামরুল হাসানও ঐতিহ্যে সমর্পিত শিল্পী ছিলেন, কিন্তু ঐতিহ্যকে তিনি মিলিয়েছেন গতিশীল জীবনের সঙ্গে। সমকালের সমস্যাগুলির একটি সমাধান পেয়েছেন ঐতিহ্য চিন্তায়, কিন্তু তিনি জানতেন, প্রতিটি সময়কাল তার নিজের দাবি নিয়ে আসে শিল্পের কাছে—সেটা মেটাতে হয়। তিনি বিমূর্ততাকেও মূল্য দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর যে বিশেষ শিল্পভাষা ছিল, তাতে বিমূর্তায়ন শ্রেষ্ঠ আসনটি পায়নি—সে আসন তিনি তৈরী করেছিলেন ঐতিহ্যের কাঠ দিয়ে এবং সে আসনে তিনি বসিয়েছেন তার নিজস্ব শিল্পভঙ্গিকে। (ইসলাম অক্টোবর: ২০১৮)।

এছাড়া কামরুল হাসানের ছবির সাথে সমসাময়িক জয়নুলের ছবির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম জীবনে বাংলার লোকশিল্পের প্রতি জয়নুল আবেদিনের খব একটা আকর্ষণ ছিলো বলে জানা যায় না। বিশেষ করে কলকাতা জীবনে অনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্য-বঙ্গীয় শিল্পরীতি এবং যামিনী রায়ের লোকশিল্প ধারার চিত্ররীতি থেকে নিজেকে দরে সরিয়ে রেখেছিলেন বলে গবেষকদের তথ্য এবং সেই সময়ের তাঁর চিত্রকর্ম পর্যালোচনা করলে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে লোককলার দিকে তাঁর আকর্ষণ ঘটে অনেকটা আকস্মিক ভাবে। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর তাঁর মাঝে নিজস্ব শিল্প ঐতিহ্য লোকশিল্প ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তনের কথা জানা যায়। যা সে সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর পটুয়া কামরুল হাসানের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো। তার ভাষায়—

> তিনি যেনো নতুন আলোকে আলোক প্রাপ্ত হয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রভাব ও পদ্ধতি থেকে সম্পর্ণ মুক্ত এক অন্য মানুষ তিনি। ১৯৩৯ সালে ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুরুসদয় দত্তের কাছে বাংলার শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলাম, শিল্পাচার্যের মুখে শুনলাম তারই কথা। (আজিম ২০০০: ৯৮)।

একথা স্পষ্ট জয়নুল আবেদিন এবং পটুয়া কামরুল হাসান উভয় শিল্পীই বাংলার ঐতিহ্য লোকশিল্পের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শিল্পচর্চায় গ্রাম বাংলার মাটির পুতুলের গড়ন, বিশেষ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের টেপা পুতুলের গড়ন এদের দুজনকেই প্রভাবিত করেছিল। কামরুল হাসানের নারী চরিত্রগুলি দেখলে তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারীদেহ পুতুলের মতো ভরাট গ্রীবা অতিরঞ্জিত ভাবে দীর্ঘ, শাড়ির নক্সা পুতুলের গায়ে আঁচড় কাটা ডোরার মতোই, চোখ-নাকের নকশাও পুতুলের আঙ্গিকে। ফলে তাঁর চিত্রকর্মে লে. কিকতা তথা লোককলার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কামরুল হাসান পুতুলের ফর্ম নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। চিত্রকর্মে নারী চরিত্রগুলি এসেছে বিভিন্নভাবে ঘুরে ফিরে পতুলের আঙ্গিকে। কখনো মা শিশুর ভঙ্গিতে,

কখনো একক, দৈত্য বা ত্রয়ী নারীমুখ, পরিবার প্রভৃতি রূপে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পশুপাখি, প্রকতি এ জাতীয় নানান বিষয়। যেখান থেকে তিনি তৈরী করেছেন শিল্পের নতুন নতুন মোটিফ। যেখানে রেখা হয়ে ওঠে সহজ ও সতেজ। যা বাংলার পটচিত্রীদের মতো। (ইসলাম ১৯৯৫: ১২৬-১২৭)। লোকশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল ও অলংকারিক। পটুয়া কামরুল হাসানের ছবিতে ফর্মের সরলিকরণ, রেখার নিরবিচ্ছিন্নতা, মৌলিক ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, বিষয় বস্তুর বিন্যাস, সর্বপরি চিত্রকর্মে সহজ সরল ভাষা স্পষ্ট করে লোকশিল্পের প্রভাব। সময়ের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম পর্বে লোককারুশিল্পীর তৈরী মাটির পুতুলের গড়ন, কালীঘাটের পট কামরুল হাসানকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে তাঁর ছবিতে নারীদেহ পতুলের মতো ভরাট, গ্রীবা অতিরঞ্জিত দীর্ঘ চোখ-নাক লৌকিক আদলে রীতিবদ্ধ এবং পটজুড়ে নকশাধর্মী দ্বিমাত্রিকতা স্থান পেতে শুরু করে। তিন কন্যা, গুনটানা এ রীতির কাজ। গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্য বিশেষত তার চিত্রকর্ম পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়, পটুয়া কামরুল হাসানের চিত্রকলায় বাংলার আবহমান কালের পটচিত্রের আঙ্গিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো মূলত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে।

পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই শিল্প আঙ্গিকের সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলার কিছু বৈশিষ্টের সংমিশ্রণ করেছিলেন। ষাটের দশক থেকে কামরুল হাসানের সৃষ্টিকর্ম পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় তিনি প্রথাগত রীতি পদ্ধতি ছেড়ে হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশী সমসাময়িক ও সমাজসচেতন। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশা তাঁর সৃজনকর্মে নানান প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে। ঘুরে ফিরে এসেছে পেঁচা, শেয়াল, কঙ্কালের ব্যবহার। কমনীয় ও সুখপ্রদ বিষয়ের চেয়ে কর্কশ ও ভয়াল বিষয়ের পক্ষপাত তাঁর এই সময়ের চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়। চন্দ্রালোকে হতভাগ্য ঘোড়া, শেয়াল, গণহত্যার পরে, ইমেজ (চিত্র-৪) প্রভৃতি চিত্র এর উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। (মনসুর ২০১৬: ৪১১-৪১২) বাংলার লোকশিল্পের সরাসরি অনুসরণ ও যামিনী রায়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠে ষাটের দশকে তিনি বিভিন্ন নিরীক্ষায় রত হন। দেশজ উপাদানের সঙ্গে মিলিত করলেন পিকাসো-মাতিস (চিত্র-৭) প্রমুখের রেখাচিত্রের সংক্ষিপ্ত, নিশ্চিত অতিরঞ্জন ও রূপান্তরণ, কিংবা কিউবিজমের মতো করে বিভিন্ন দষ্টিকোণ থেকে রেখার উপস্থাপনা। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে তার কাজে ক্রমে যক্ত হতে থাকে রঙ্গ-তামাশা, ফ্যান্টাসি প্রভৃতি। (মনসুর ২০১৬: ৪০২)।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি যেমন বিষষবস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে সমসাময়িক হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি চিত্র আঙ্গিকেও এনেছিলেন পরিবর্তন। দীর্ঘ চার দশক কামরুল হাসান শিল্পকর্ম নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তার এই পরীক্ষা নিরীক্ষা শুধু মাত্র বাংলার ঐতিহ্য লোকশিল্পের উপরই নিভর্রশীল থেকেছে তা বলা যাবে না বরং

বাংলার শিল্প ঐতিহ্যের প্রসার ঘটাতে আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলার কিছু কিছু শক্তিশালী চিত্র উপাদানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে তিনি সচেতনভাবে নিজস্ব যে শিল্পধারা গড়ে তুলেছিলেন সেখানে লৌকিকতা ও আধুনিকতার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

চিত্র-৭ ম্যাডোনা, জলরং
৬০ x ৪৬ সেমি, ১৯৫০

চিত্র-৮ নায়র, তেলরং,
১২০ x ৮০ সেমি, ১৯৭৫

এপ্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন গবেষকদের মতামত উপস্থাপন করা যেতে পারে। কামরুল হাসানের ছবি সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের পর্যালোচনা—তিনি তাঁর চিত্রকর্মে উপস্থাপিত নারীদের চোখ খব বাঙময় করে আঁকতেন। এরকম প্রকাশবহুল চোখ অন্য কোনো শিল্পীতে তেমন একটা দেখা যায় না। আবার তাঁর মতামতের প্রসঙ্গ টেনে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন—প্রাচ্যবাদী ছবির অর্ধনিমীলিত অথবা ভঙ্গি-নির্ধারিত চোখ ও দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার পর যামিনী রায়ের মানুষজনের চোখ দেখলে যেমন মাটির পুতুল ও পটুয়া ঐতিহ্যের এবং লোককল্পনার পটলচেরা চোখের কথা মনে পড়ে সেরকম কামরুল হাসানের নারীদের চোখ দেখলেও প্রসন্নতা ও বিশালতার পাশাপাশি তাদের আবেগ, অনভূতি, উৎকণ্ঠার ছাপও অনিবার্যভাবে মনে পড়বে। (ইসলাম, অক্টোবর ২০১৮)। ফলে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয় যে, তাঁর শিল্প লোকশিল্পের প্রভাবজাত হলেও তা আধুনিকতা বর্জিত নয়। এই দুই ধারার সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন শিল্পের এক নতুন স্টাইল। সেই বিবেচনায় কামরুল হাসানের চিত্রকর্মকে লোকশিল্প গবেষক নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালীন শিল্পী ও শিল্প গ্রন্থে "লোকজ-আধুনিক।" (ইসলাম ১৯৯৫: ২৩) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই মতামতের সাথে দ্বিমত করার কোন উপায় নেই। পটুয়া কামরুল হাসান সর্বদা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রূপান্তরের ধারায় শিল্পসৃষ্টিতে সক্রিয় ছিলেন। চিত্রাঙ্কনে সচ্ছল, সবেগ ও সতেজ রেখা এবং হালকা ও প্রাথমিক রঙ এবং দ্বিমাত্রিক ডিজাইনে তাঁর প্রায় প্রতিটি চিত্রকর্মই নতনত্বের পূর্ণতা দান করেছে এবং শিল্পীকে দাড় করিয়েছে বাংলার আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে এক অনন্য স্বতন্ত্রতায়।

উপসংহার

পটুয়া কামরুল হাসানের শিল্পদর্শনের কেন্দ্রভূমিতে পাওয়া যায় ঐতিহ্যপ্রিয়তা ও বাঙালীয়ানার স্বাদ। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মেই যেন হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির ছাপ রয়ে গেছে। তিনি মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালি, তাই বাঙালির স্বরূপ সত্ত্বাকে বার বার খুঁজে বেড়িয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। তাঁর জীবনীতে যেমন আমরা লোকশিল্পের প্রতি তাঁর প্রবল আবেগ খুঁজে পাই, পাশাপাশি খুঁজে পাই আধুনিকতাকেও। তিনি আধুনিকতাকে ধারণ করেছিলেন প্রবাহমান লোকজীবনধারায় উৎসরিত শিল্পে। ফলশ্রুতিতে লোকঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পের এক বিশাল ভাণ্ডার, চিত্রকর্মকে দিয়েছেন ভিন্ন আঙ্গিক, দিয়েছেন ভিন্ন মাত্রা। তাঁর হাত ধরেই শিল্পধারাটি অর্জন করেছে ঈর্ষান্বিত সাফল্য। আবার শিল্পচর্চা ও পটুয়া নামের মধ্য দিয়ে যুগান্তর সৃষ্টিকারী এ শিল্পী বহমান বাংলার লোকশিল্প বিশেষত পটশিল্পকে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে তুলে যেন এক নতুন পরিচয়ে পরিচিতি ঘটান সমগ্র পৃথিবীতে। সেই সাথে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বির্নিমাণে ও যুদ্ধ পরবর্তী বাংলার শিল্পের অবকাঠামো নির্মাণেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি সমকালের আর্তিকে যেমন তাঁর শিল্পে ধারণ করেছিলেন, তেমনি আপন ঐতিহ্যের শেকড়ে গভীরভাবে গ্রথিত করতে পেরেছেন তাঁর সৃজনের সকল প্রণোদনাকে। যেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে তাঁর চিত্রকর্মের নিজস্ব রীতি। যা তিনি ঘটিয়েছেন লৌকিকতার সাথে আধুনিকতার মিশেলে। তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মই যেন প্রবাহমান বাংলার আপন শিল্পের এক একটি দলিল। যা পটুয়া কামরুল হাসানকে বাঁচিয়ে রাখবে যগযগান্তর বাংলার কোটি শিল্প অনুরাগীর প্রাণে।

তথ্যসূত্র

আজিম, ফয়েজুল (২০০০)। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলী, মতলব (১৯৯৪)। *শিল্পী ও শিল্পকলা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলী, মতলব (২০০১)। কামরুল হাসানের বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব: একটি ভমিকা। মুস্তাফা জামান আব্বাসী (সম্পা.) *শিল্পকলা*, ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৫)। *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসলাম, সৈয়দ মঞ্জুরুল (অক্টোবর ২০১৮)। *শিল্প ও শিল্পী*। সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, https://bit.ly/3g4G4KJ.

মনসুর, আবুল (২০১৬)। বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পে লোককলার প্রয়োগ: কামরুল হাসান। *শিল্পকথা শিল্পীকথা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

সোম, শোভন (২০১৭)। *যামিনী রায়ের ছবি: রীতি ও তাৎপর্য*। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), যামিনী রায়: পত্রাবলী ও প্রবন্ধ। অনুষ্টুপ, কলকাতা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৩)। *কামরুল হাসান*। সুবীর চৌধুরী (সম্পা.)। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৭)। কামরুল হাসান। লালা রুখ সেলিম (সম্পা.)। *চারু ও কারু কলা*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসান. কামরুল (২০১৭)। *খেরো খাতা*, ১ম খণ্ড। মধ্যমা, ঢাকা।

হাসান, কামরুল (২০০৮)। লোকশিল্পের মর্মকথা। শামসজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।